এ লড়াই প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়

তসলিমা নাসরিন

'পশ্চিমের নারীবাদ' কেন, 'প্রাচ্যের নারীবাদ' সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণা ছিল না। ওসব না জেনেও শিশু বয়স থেকেই পরিবারের এবং সমাজের অনেক আদেশ উপদেশ, অনেক বাধা নিষেধকে আমি প্রশ্ন করেছি। আমাকে যখন বাইরের মাঠে খেলতে দেওয়া হত না, কিন্তু আমার ভাইদের দেওয়া হত, ঋতুশ্রাবের সময় আমাকে যখন 'অপবিত্র' বলা হত, আমাকে যখন বলা হত আমি এখন বড় হয়েছি, যেন কালো বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে বাইরে বেরোই, আমি প্রশ্ন করেছি, আমি মানিনি। রাস্তায় হাঁটলে আমাকে যখন গালি ছুড়ে দিত অচেনা ছেলেরা, যখন ওড়না কেড়ে নিত, স্তন টিপে ধরতো, প্রতিবাদ করেছি। ঘরে ঘরে যখন দেখেছি স্বামীরা বউ পেটাচ্ছে, কন্যা-শিশু জন্ম দিয়ে মেয়েরা আশংকায় কাঁদছে, আমি সইতে পারিনি। ধর্ষিতা মেয়েদের লজ্জিত মুখ দেখে বেদনায় নীল হয়েছি। পতিতা বানানোর জন্য এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে মেয়েদের পাচার করার খবর শুনে কেঁদেছি। শুধু দুটো ভাত জোটাতে পতিতাপল্লীতে মেয়েরা চরম যৌন-নির্যাতন সইতে বাধ্য হচ্ছে , পুরুষেরা চার চারটে মেয়েকে বিয়ে করে ঘরের দাসি বানাচ্ছে, উত্তরাধিকার থেকে শুধু মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে বঞ্চিত হচ্ছে, পারিনি মেনে নিতে। যখন দেখতাম ঘর থেকে দু পা বেরোলে মেয়েদের একঘরে করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, 'পরপুরুষ'কে ভালোবাসার অপরাধে তাদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, উঠোনে গর্ত করে সেই গর্তে ঢুকিয়ে মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে, আমি চিৎকার করতাম। কোনও যুক্তি দিয়ে কোনও বুদ্ধি দিয়ে মেয়েদের ওপর পুরুষের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের ওসব অত্যাচার মেনে নিতে পারিনি। আমার সেই বেদনা, সেই কান্না, সেই অস্বীকার, সেই মেনে-না-নেওয়া, সেই বাকরুদ্ধ হওয়া, সেই না-সওয়া, সেই যুক্তি তর্ক, সেই চিৎকার কেউ দেখেনি। দেখলো, যখন থেকে লিখতে শুরু করলাম।

আমি যে সমাজে বড় হয়েছি, সেই সমাজে অনেকের মনেই প্রশ্নের উদয় হত। তারা মেনে নিতে বাধ্য হত পুরুষতন্ত্রের কর্তাদের উত্তর। আমি বাধ্য হইনি। আমাকে কেউ অবাধ্য হতে শেখায়নি। কোনও বই পড়ে আমি অবাধ্য হওয়ার শিক্ষা অর্জন করিনি। সচেতন হওয়ার জন্য বড় বড় বই পড়তে হয় না। দেখার চোখ থাকলেই অনেক কিছু দেখা যায়। বুকের পাটাটাও কেউ গড়ে দিয়ে যায় না। গ্রামের মেয়েরা যখন জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, জমি কেড়ে নিতে চাইলে 'দেব না' বলে রুখে দাঁড়ায়, সেই মেয়েরা কোনও কার্ল মার্কস বা লেনিনের বই পড়ে ওই প্রতিবাদটা শেখে না। জীবনই তাকে জীবনের প্রয়োজনে বলে দেয় কী করতে হবে বা হবে না।বুদ্ধির মুক্তি কারওর হয়, কারওর হয় না। বড় বড় দর্শনের বই পড়েও মানুষ

অশিক্ষিত থেকে যায়, কোনও বই না পড়েও অনেকের বোধবুদ্ধি জন্ম নেয়। নারীর অধিকারের দাবি করতে গেলে বেটি ফ্রিডান বা রবিন মরগ্যান পড়তে হয় না। নিজের চেতনই যথেষ্ট।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজের অধিকারের বিষয়ে যাঁদের সচেতনতা এসেছে, তাঁদের একের সঙ্গে অপরের জানাশোনা হওয়ার কোনও দরকার হয়নি। মুক্তবুদ্ধির মানুষের চিন্তাধারা এবং ভাষার মধ্যে মিল থাকেই। পুবের নারীরা যখনই বন্ধ ঘরের কপাট খুলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে তখনই পুবের পুরুষবাদীরা তাদের দোষ দিয়েছে যে তারা পাশ্চাত্যের নারীবাদীদের অনুকরণ করছে। আমার ক্ষিধে পেলে আমি খাবো, আমাকে চাবুক মারলে আমি চাবুক কেড়ে নেবো, আমাকে পিষতে চাইলে আমি উঠে দাঁড়াবো-- এটা চিরকালীন। নারীবাদ পাশ্চাত্যের সম্পত্তি নয়। নির্যাতিত, নিস্পেষিত, অত্যাচারিত, অসম্মানিত, অবহেলিত নারীদের একজোট হয়ে নারীর অধিকারের জন্য জীবন বাজি রেখে কঠিন সংগ্রাম করার নাম নারীবাদ।

পশ্চিমের মেয়েদের জীবন জানতে গিয়ে দেখেছি ওরাও কম দুর্ভোগ পোহায়নি। অত্যাচারিত হতে হতে, রক্তাক্ত হতে হতে ওদেরও দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। একসময় চিৎকার করেছে। পুরুষতান্ত্রিকতা, ধর্ম, নারী বিরোধী সংস্কার ইত্যাদির শিকার হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভুগেছে পুবের মেয়েদের মতো পশ্চিমের মেয়েরাও। ধর্মান্ধরা তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে,নারী বিরোধী সংস্কার তাদের শরীরে সতীত্বের লোহার খাঁচা পরিয়ে দিয়েছে, তাদের যৌনদাসি করে রেখেছে, ক্রীতদাসী করেছে। মেয়ে হওয়ার অপরাধে মেয়েরা একই রকম ভোগে পুবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে। পশ্চিমের মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলো, যুগের পর যুগ সে আন্দোলন তাদের চালিয়ে যেতে হয়েছে। ভোটাধিকারের আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের অপমানিত হতে হয়েছে। পুরুষেরা তাদের দিকে থুতু ছুড়েছে, গালি দিয়েছে। তবু তারা বারবার একই কথা বলে গেছে, 'বৈষম্য যে করেই হোক ঘোচাতে চাই, সমানাধিকার যে করেই হোক চাই।' শতাব্দি জুড়ে আন্দোলনের ফলে তারা আজ যে-টুকু অধিকার অর্জন করেছে, তা সম্পূর্ণ নয়। গর্ভপাতের অধিকারের জন্য মেয়েরা আজও লড়ছে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আজও তারা প্রতিবাদ করছে, শ্রমিকের সমান বেতনের দাবিতে আজও মিছিলে নামছে, সংসদে নারী সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আজও আন্দোলন করছে। আশ্রয় কেন্দ্রে আজও নির্যাতিত মেয়েদের ভিড়। হ্যাঁ পাশ্চাত্যের সাদা মেয়ে, সোনালী চুলের মেয়ে। এখনও প্রতারিত হয়ে, এখনও অভাবে অত্যাচারে তাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয় শরীর বিক্রি করতে। আশির দশকে নারীবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সাফল্য এসেছে পশ্চিমে। নারীবাদকে নেতিবাচক সংজ্ঞায় পুরে প্রায় আস্তাকুড়ে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। আইনে সমানাধিকার জুটলেও পুরুষতান্ত্রিকতা এবং ধর্মান্ধতা নিরলস ফণা উঁচিয়ে থাকে, সুযোগ পেলেই ছোবল দেয়। নারীবিরোধী-মানসিকতা পশ্চিমের অধিকাংশ পুরুষের মস্তিস্কের বড় অংশ জুড়ে এখনও ঘাঁপটি মেরে থাকে ।

নারী নির্যাতনের কোনও দেশভেদ নেই। সমানাধিকারের বা মানবাধিকারের কোনও পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হয় না। মেয়েরা সব দেশেই সব কালেই নির্যাতিত। মানবাধিকার ইউনিভার্সাল। বিশ্বজনীন। প্রাচ্যের জন্য আলাদা মানবাধিকারের কথা বলে 'বিশ্বজনীন মানবাধিকার' থেকে যারা আলাদা হতে চায় এবং মনে করে এই করেই বুঝি পাশ্চাত্যের এতকালের নিষ্পেষনের বিরুদ্ধে ভারী একটা যুদ্ধ করা গেল, তারা পাশ্চাত্যের নয়, প্রাচ্যের ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি করে। পাশ্চাত্যের বিদেশনীতি প্রাচ্যকে শোষণ করেছে। সবল মাত্রই দুর্বলের ওপর যে শোষণ করে, সেই শোষণই করেছে। প্রাচ্যের ক্ষমতাসীনরাও প্রাচ্যের সাধারণ মানুষকেও শোষণ করে চলেছে, ওই একই কায়দায়। পাশ্চাত্যের ক্ষমতাসীন, বর্ণবাদী, উন্নাসিক এবং পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষকে এক করে দেখার কোনও কারণ নেই। পৃথিবীর সব দেশের সাধারণ মানুষ, সে প্রাচ্যে হোক , পাশ্চাত্যে হোক অত্যাচারী দ্বারা কোনও না কোনও ভাবে অত্যাচারিত। যুদ্ধটা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়। যুদ্ধটা সর্বকালেই সর্বদেশেই ক্ষমতাবানের সঙ্গে ক্ষমতাহীনের, যুদ্ধটা বৈষম্যের সঙ্গে সমানাধিকারের। বিরোধ বর্বরতার সঙ্গে বোধের, অন্ধের সঙ্গে আলোকিতের, অজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞানের, অযুক্তির সঙ্গে যুক্তির, পরাধীনতার সঙ্গে স্বাধীনতার,অলৌকিকের সঙ্গে লৌকিকের, অমানবিকতার সঙ্গে মানবিকতার, রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতির, পুরাতনের সঙ্গে নতুনের। এই যুদ্ধ দেশকালবর্ণলিঙ্গশ্রেণী নির্বিশেষে সর্বত্র চলেছে, আজও চলছে।

ধর্মীয় স্পর্শকাতরতায় আঘাত দিয়েছি আমি, এমন প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে। ধর্মের সঙ্গে নারীবাদের বিরোধ চিরকালের, নারীর অধিকার সম্পর্কে অতি সামান্য জ্ঞান যার আছে, সে-ই এটা জানে। ধর্ম আগাগোড়াই পুরুষতান্ত্রিক। আমি ধর্মও মানবো, নারীর অধিকারও মানবো, এ অনেকটা আমি বিষও খাবো, মধুও পান করবোর মতো। যখনই নারীর অধিকার আদায়ের জন্য নারীর ওপর ধর্মীয় নির্যাতনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তখনই *ধর্মীয় স্পর্শকাতরতাকে আঘাত দেওয়া চলবে না* এই স্লোগান তুলে গণতন্ত্র বিরোধী, বাক-স্বাধীনতা বিরোধী, নারী-স্বাধীনতা বিরোধীরা সরব হয়ে উঠেছে দেশে দেশে । ধর্মের বর্ম ব্যবহার করে পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র খুব পুরোনো। কোনও 'সংস্কৃতি' যদি নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করে রাখে, সেই সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করা; সে সংস্কৃতি হিন্দুর হোক, মুসলিমের হোক, ক্রিশ্চানের হোক, ইহুদির হোক-- কোনও সুস্থ, সভ্য, প্রগতিশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কোনও বর্বরতাকে সংস্কৃতি বলি না। বর্বরতার বিরুদ্ধে চিরকাল সব সংস্কৃতির মানুষই প্রতিবাদ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর রাম মোহন রায়কেও হিন্দুর ধমীর্য় অনুভূতিতে আঘাত করতে হয়েছিলো।

মুসলিমের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতায় আঘাত লেগেছে বলে কিছু কূপমণ্ডুক এক বাক্যে রায় দিয়ে দেন যে আমার বয়ান পাশ্চাত্যের বয়ান, পশ্চিমের চোখে প্রাচ্যকে দেখার বয়ান। সহিষ্ণুতার নামে মুসলিম মৌলবাদীদের এই অর্থহীন-যুক্তিহীন দাবিটি তথাকথিত ভারতীয় সংজ্ঞার

‘সেকুলার’ নামধারীরা প্রায়শ উচ্চারণ করেন। পাশ্চাত্য মুসলিম সংস্কৃতি বিরোধী হলে লক্ষ লক্ষ মুসলিম পাশ্চাত্যে বাস করতে পারতো না, নিরাপদে নিশ্চিন্তে তাদের ধর্মচর্চা করে যেতে পারতো না, এলাকায় এলাকায় মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে তুলতে পারতো না। ইরাকের যুদ্ধের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মানববাদীর মিছিল হতো না। আজ ব্রিটেনে মুসলিমরা তাদের নারী- বিরোধী শরিয়া-আইন, যে আইনে পুরুষের বহুবিবাহ, পুরুষের নারী নির্যাতন, নারীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা, নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা আইনসিদ্ধ হবে--- সেটি আনার দাবি তুলছে, এতে সায় দিচ্ছে ইংলেন্ডের বিশপ সহ বেশ কজন ব্রিটিশ মন্ত্রী। মুসলিমদের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে এঁরা কি মুসলিমদের সত্যিকার কোনও উপকার করবেন? যারা আজ সমানাধিকারের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে মুসলিমদের বৈষম্যের সংস্কৃতি লালন করার পক্ষে, তারা মুসলিমদের মঙ্গলাকাঙ্খী নন, তারাই মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ক্রিশ্চান সমাজে ধর্মীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে আইন তৈরি হয়েছে, হিন্দু সমাজে হয়েছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে ধর্মান্ধতার অন্ধকার বিরাজ করুক, সংস্কৃতির নামে বর্বরতা চলুক, নারী পুরুষের চরম বৈষম্য টিকে থাকুক, তাকে বাহবা দিয়ে যাবো, প্রগতির পথে মুসলিমদের চলতে দেব না, তাদের আলোকিত হতে দেব না--- এই মানসিকতার মানুষ মুসলিম সমাজের কত বড় যে ক্ষতির কারণ, তা মুসলিমরা আজ না বুঝলেও নিশ্চয়ই একদিন বুঝবে। মুসলিম সমাজের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যে মেয়েরা আজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নির্বাসনের হুমকি নিয়ে নারীর অধিকারের কথা বলছে --- সেই মেয়েদের সেই কথাকে ‘পাশ্চাত্যের বয়ান’ বলে যারা হেয় করে, তাদের আধুনিকতাকে আমি ধিককার দিই।

ক্রিশ্চান ধর্ম বা ইহুদি ধর্ম এবং অন্য আরও নারী-বিরোধী ধর্মের নিন্দা আমি করেছি, কিন্তু তারপরও এ নিয়ে কোনও অভিযোগ করে না কেউ। অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিলে কেউ আমাকে হত্যা করার ফতোয়া দেয় না। যারা ফতোয়া দেয় তাদের অসহিষ্ণুতাকে মেনে নিতে, তাদের ‘ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা’কে সম্মান দেখাতে লোকের কোনও অসুবিধে হয় না এবং নির্দ্বিধায় আমাকে ‘অসহিষ্ণু’ বলতে তাদের বাধে না। সম্ভবত তাঁরা আমাকে ‘মুসলিম’ হিসেবে দেখছে, মুসলিম হয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আমার আঘাত হানাকে স্পর্ধা বলে বিবেচনা করছেন। কবিতা সিংহ নারীবাদের কথা লিখলে বা জার্মেন গ্রিয়ার লিখলে ঠিক আছে, তসলিমা লিখলে ঠিক নেই। কারণ ‘তসলিমা মুসলিম’। মুসলিম মেয়েদের একটু রয়ে সয়ে চলতে হয়, মুখটা অন্য ধর্মগোষ্ঠীর মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি বুজে থাকলে মানায়।
কিন্তু সত্য কথা হলো, নারীর অধিকারে বিশ্বাস করলে ধর্মপরিচয় থেকে প্রথমেই নিজেকে মুক্ত করতে হয়। কৈশোরের শুরুতেই ও থেকে আমি মুক্ত। যখন শিশু ছিলাম, শিশুদের গায়ে যেমন অন্যায়ভাবে ধর্ম-পরিচয় এঁটে দেওয়া হয়, তেমনই আমার গায়েও এঁটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু,

একটি শিশুকে তার বাবা-মার ধর্মবিশ্বাস দিয়ে চিহ্নিত করা নিশ্চিতই শিশু-নিগ্রহ। একটি শিশুকে তো আমরা তার বাবা-মার রাজনৈতিকবিশ্বাস দিয়ে চিহ্নিত করি না। আমরা কোনও কমিউনিস্টের বাচ্চাকে কমিউনিস্ট বলি না। কিন্তু দু বছরের একটি বাচ্চাকে দিব্যি হিন্দু, বা মুসলিম বা খ্রিস্টান বলে রায় দিয়ে দিতে আমরা দ্বিতীয়বার চিন্তা করি না। শিশু বড় হওয়ার পর বাবা-মার ধর্ম, বা অন্য কোনও ধর্ম, বা কোনও ধর্ম-নয়, পছন্দমতো কিছু একটা গ্রহণ করবে। তাই তো হওয়া উচিত।আমার জীবনে আমি তা ঘটিয়েছি। আমি মানববাদ বা মানবতন্ত্র বেছে নিয়েছি বিশ্বাসের জন্য। আমাকে 'মুসলিম রিফর্মার' ভেবে ভুল করা উচিত নয়। আমি রিফর্মার নই, কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীরও কেউ নই। আমার গোষ্ঠী ধর্মমুক্ত মানববাদীর।